The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 13, No. 25-26, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলা যুক্তবর্ণ: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপের দ্বন্দ্ব

তারিক মনজুর*

Abstract: Conjuncts are formed by connecting two or more Bengali letters. In general sense, the Bengali conjuncts have two structures or forms: simple form and opaque form. Some conjuncts have only simple forms, some have only opaque forms and some have both simple and opaque forms. Once upon a time, many of the conjuncts had simple form, but in medieval manuscripts, they gradually took an opaque form. Again in modern age, many opaque forms of conjuncts are used in simple forms. In hand writing and typing or font, there is no similarity between the simple and opaque forms of many conjuncts. Attempts are currently being made to make the conjuncts simple. But, there are opposing views, there are some misconceptions and confusions regarding this issue. In this article, the concept of conjuncts has been clarified; different views have been verified in the course of history and decisions have been made on simple and opaque forms of the conjuncts in the end.

চাবি শব্দ: বাংলা যুক্তবর্ণ, মধ্যযুগের পুথি, ছাপাখানা, যুক্তবর্ণের উচ্চারণ, কারচিহ্ন, ফলাচিহ্ন, টাইপোগ্রাফি, ফন্ট।

১. ভূমিকা

বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর উনিশ শতকের প্রথমভাগে বাংলা যুক্তবর্ণ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা শুরু হয়। বিশ শতকের তিনের দশকে লাইনোটাইপ আসার পর যুক্তবর্ণ বিষয়ক ভাবনা বাংলা বানানকেও প্রভাবিত করে। বর্তমান সময়ে ছাপার কাজে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে যুক্তবর্ণ নিয়ে আগের অনেক ভাবনা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কম্পিউটার ফন্টে যে-কোনো ধরনের যুক্তবর্ণ তৈরির সুযোগ থাকলেও প্রযুক্তিগত এই সুবিধা যথেষ্টভাবে কাজে লাগাতে দেখা যাচ্ছে না। যাঁরা টাইপোগ্রাফি ও ফন্ট নিয়ে কাজ করেন, তাঁদেরকেও যুক্তবর্ণ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্দেশনা দেওয়া জরুরি। এই প্রবন্ধে যুক্তবর্ণের সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে; মধ্যযুগের পুথিতে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে; ছাপাখানা চালুর পর যুক্তবর্ণ বিষয়ক ভাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে; এ-বিষয়ক বিভিন্ন মত, ভুল ধারণা ও দ্বিধার মূল্যায়ন

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করা হয়েছে; এবং সবশেষে আলোচনার সূত্র ধরে যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ রূপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দুই বা দুইয়ের বেশি বর্ণ একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে বাংলা যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। কিছু যুক্তবর্ণের আকৃতি বা কাঠামো এমন থাকে, যা দেখে বোঝা যায় কোন কোন বর্ণ সংযুক্ত আছে; এগুলোকে স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ বলে। আবার কিছু যুক্তবর্ণের আকৃতি দেখে সাধারণভাবে ঠিক বোঝা যায় না, এতে কোন কোন বর্ণ বিদ্যমান আছে; এগুলোকে অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ বলে। মধ্যযুগের হাতে-লেখা পুথিতে যুক্তবর্ণ বহু বৈচিত্র্য নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে; সেসময় কিছু যুক্তবর্ণকে স্বচ্ছ থেকে অস্বচ্ছ রূপ ধারণ করতেও দেখা যায়। আধুনিক যুগের প্রথম দিকে টাইপ ও ফন্টের সুবিধার্থে এবং পরের দিকে শিক্ষার্থীদের কাছে অধিকতর বোধগম্য করতে অনেক অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণকে স্বচ্ছ করা হয়েছে। যুক্তবর্ণ বিষয়ক অতীত ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে, এখন স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ রূপের দ্বিধার যথাসম্ভব অবসান ঘটানোর সময় হয়েছে।

২. তাত্ত্বিক ধারণা

প্রচলিত অর্থে যুক্তবর্ণ বলতে বোঝায় দুটি বা এর বেশি ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনের ফলে সৃষ্ট যৌগিক বর্ণ। কিন্তু মনসুর মুসা যুক্তবর্ণ বলতে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ যে কোনো ধরনের দুটি বর্ণের মিলনকে বুঝিয়েছেন:

একটি অক্ষরের সঙ্গে আর একটি অক্ষর অর্থাৎ এক বর্ণের সঙ্গে আরেক বর্ণ সমন্বিত হলে তাকে যুক্তবর্ণ বলতে হয়। কাজেই স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ যুক্ত হলে যেমন যুক্তবর্ণ হবে, তেমনি স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগ হলে তাও যুক্তবর্ণ হবে। আবার ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হলে তাও যুক্তবর্ণ হবে। (মুসা, ২০০৭: ৭৩)

বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ বাংলা হরফের পাশাপাশি ইংরেজি ও আরবি হরফের সঙ্গেও পরিচিত। কিন্তু ইংরেজি ও আরবি ভাষায় বাংলার মতো যুক্তবর্ণ দেখা যায় না। বর্ণের সঙ্গে বর্ণের সংযুক্তিতে যৌগিক বর্ণ তৈরি হয় বাংলায়; এদিক থেকে মুসা (২০০৭)-এর সংজ্ঞায়নকে যথার্থ বলে মানতে হয়। দেখা যাচ্ছে, বাংলায় তিন ধরনের যুক্তবর্ণ তৈরি হতে পারে: (১) স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণের মিলনে; যেমন – ঐ, ঔ; (২) ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের মিলনে; যেমন – শু, রূ; (৩) ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে; যেমন – ঙ্গ, গ্ধ, জ্ঞ, ন্ত্র।

যুক্তবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ। কোন কোন বর্ণ যুক্ত রয়েছে, সেটি যুক্তবর্ণের আকৃতি দেখে বোঝা গেলে তাকে স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ বলে; যেমন – শ্চ, ত্ব, ক্ল ইত্যাদি। আবার কোন কোন বর্ণ যুক্ত রয়েছে, সেটি যুক্তবর্ণের আকৃতি দেখে বোঝা না গেলে তাকে অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ বলে; যেমন – ক্ষ, ক্ষ্ম, ক্র ইত্যাদি। যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দুরকম রূপের পাশাপাশি মনসুর মুসা অর্ধস্বচ্ছ রূপের কথা বলেছেন –

স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ: যুক্তবর্ণের রূপ দেখে বোঝা যায়, যেমন ক+ক = ক্ক, চ+চ = চ্চ, দ+দ = দ্দ, ন+দ = ন্দ ইত্যাদি।

অর্ধস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ: এগুলোর কিছু অংশ চেনা যায় এবং কিছু অংশ চেনা যায় না। যেমন: ত্ত = (ত+ত), জ্ঞ = (জ+ঞ), ঞ্ঝ = (ঞ+ঝ)।

অনচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ: এই ধরনের যুক্তবর্ণগুলোর ভেতরে কোন্ কোন্ যুক্তবর্ণ আছে সেটি দৃশ্যমান নয়। যেমন ক্ষ = (ক+ষ), হ্ম = (হ+ম), ক্র = (ক+র)। (মুসা, ২০০৭: ৭৪)

তবে, অর্ধস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন বলে আলাদা শ্রেণিকরণের দরকার হয় না। যুক্তবর্ণের কিছু অংশ স্পষ্ট এবং কিছু অংশ অস্পষ্ট হলে, সামগ্রিকভাবে ওই যুক্তবর্ণকে অস্বচ্ছ বলাই শ্রেয়। যেমন – ঙ্খ, থ্থ, হ্ম ইত্যাদি যুক্তবর্ণের কিছু অংশ স্পষ্ট, কিছু অংশ অস্পষ্ট। বর্তমান প্রবন্ধে এই জাতীয় যুক্তবর্ণকে অর্ধস্বচ্ছ না বলে অস্বচ্ছ বলা হয়েছে; কারণ, কোন কোন বর্ণ নিয়ে যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়েছে, তা যুক্তবর্ণের আকৃতি দেখে এখানে পুরোপুরি বোঝা যায় না।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলা যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা হবে, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। একসময় যুক্তবর্ণের অনেকগুলোই স্বচ্ছ ছিল; কিন্তু মধ্যযুগের হস্তলিপিতে সেগুলো ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ রূপ ধারণ করে; আবার আধুনিক যুগে অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের অনেকগুলো স্বচ্ছ রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। হাতের লেখায় এবং টাইপে বা ফন্টে অনেক যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপের সমতা দেখা যায় না। বর্তমানে যুক্তবর্ণকে স্বচ্ছ করার চেষ্টা আছে; আবার এ নিয়ে বিরুদ্ধ মত আছে, কিছু ভুল ধারণা ও দ্বিধাও আছে। যুক্তবর্ণ বিষয়ক ধারণাকে অধিকতর স্পষ্ট করতে এবং স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এ গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন মত যাচাই করা হয়েছে। ফলে, গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে এখানে বর্ণনামূলক-ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য-সংগ্রহের উৎস হিসেবে কাজ করেছে বিভিন্ন গ্রন্থ যেখান থেকে যুক্তবর্ণ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক মতসমূহ এবং বিভিন্ন গবেষকের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন নেওয়া হয়েছে।

৫. যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপ

বর্তমানে বাংলা ভাষায় যুক্তবর্ণগুলোর কিছু স্বচ্ছ রূপে, কিছু অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার, কিছু যুক্তবর্ণ স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ দুরকম রূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ফন্টে এবং ব্যক্তিভেদে হাতের লেখায় যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ রূপের সমরূপতা নেই। যেমনঃ ক্ত, ঙ্গ, রূ, শু ইত্যাদি যুক্তবর্ণ সাধারণভাবে টাইপে অস্বচ্ছ রূপ ধারণ করলেও, হাতের লেখায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বচ্ছ রূপেই ব্যবহৃত হয়। নতুন-পুরাতন সবধরনের বইয়ে অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ বেশি দেখা যায়। আর বর্তমানে হাতের লেখায় আর স্কুলপাঠ্য বইয়ে অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের অধিকাংশ স্বচ্ছ রূপ ধারণ করেছে। নিচে বিভিন্ন ধরনের যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ রূপের নমুনা দেখানো হলো।

৫.১ ব্যঞ্জন+স্বরঃ

- ক. স্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ কা, কি, কী, কু, কূ, কৃ, কে, কৈ, কো, কৌ ইত্যাদি।
- খ. অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ কেবল অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহৃত হয়, এমন যুক্তবর্ণ এখন নেই।
- গ. স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ গু/গু, রু/রু, রূ/রূ, শু/শু, হু/হু, হৃ/হৃ ইত্যাদি।

৫.২ ব্যঞ্জন+ব্যঞ্জনঃ

- ক. স্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ ত্ব, প্ট, ব্দ, চ্ছ ইত্যাদি।
- খ. অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ ক্ষ, জ্ঞ, ট্ট, ত্ত, ত্থ, ষ্ণ, হ্ন, হ্ম ইত্যাদি।
- গ. স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ উভয় রূপে ব্যবহারঃ ক্ত /ক্ত , ঙ্ক/ঙ্ক, ক্র /ক্র, ঙ্গ/ঙ্গা, ঞ্চ/ঞ্চ, দ্ধ/দ্ধ, ন্ধ/ন্ধ, ব্ধ/ব্ধ ইত্যাদি।

৫.৩ ব্যঞ্জন+ব্যঞ্জন+স্বরঃ

- ক. স্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ চ্ছ্ব, ত্যু, ন্তা, স্কু, স্পু ইত্যাদি।
- খ. অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ ত্রু/ত্রু, ভ্রু, ভ্রূ, ষ্ণু, হ্মা ইত্যাদি।
- গ. স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ ক্রু/ক্রু, গ্রু/গ্রু, দ্রু/দ্রু, দ্রূ/দ্রূ, ন্তু/ন্তু, শ্রু/শ্রু, শ্রূ/শ্রূ, স্তু/স্তু ইত্যাদি।

৫.৪ ব্যঞ্জন+ব্যঞ্জন+ব্যঞ্জনঃ

- ক. স্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ জ্জ্ব, ন্দ্ব, স্ট্র ইত্যাদি।
- খ. অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ ক্ষ্ম, ঙ্ক্ষ, ত্ত্ব, ন্ত্র্য, ন্ধ্র, স্ত্র ইত্যাদি।
- গ. স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপে ব্যবহারঃ স্ক্র/স্ক্র, স্ক্রু/স্ক্রু ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলোতে তিনটি পর্যন্ত বর্ণের সংযুক্তি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সর্বোচ্চ চারটি বর্ণের সংযুক্তি দেখা যায় বাংলা যুক্তবর্ণে; যেমন – ক্ষ্মী, গ্ন্য, ত্ত্বা, ন্ড্র, স্ক্র, ন্ত্র্য, জ্জ্বা, ল্ট্রা, স্ত্রী ইত্যাদি।

৬. যুক্তবর্ণের প্রয়োগ

যুক্তবর্ণ গঠিত হওয়ার জন্য কী কী বর্ণ সংযুক্ত হয়, বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের স্কুলপাঠ্য বইয়ে এটি গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। স্বচ্ছ যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রেও এ ধরনের পরীক্ষা নেয়া হয়; অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। যেমন, ক্ষ যুক্তবর্ণের মধ্যে ক আর ষ আছে, এই জ্ঞান 'ক্ষতি, রাক্ষস, রক্ষা' ইত্যাদি শব্দ বাংলা ভাষায় পড়ার বা লেখার ব্যাপারে কোনো বাড়তি সুবিধা দেয় না। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কারিকুলাম (২০১২) দেখে মনে হয়, যুক্তবর্ণের উচ্চারণ বিষয়েও কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে শিক্ষকদের মধ্যে। যুক্তবর্ণ সাধারণভাবে ভিন্ন উচ্চারণ তৈরি করে না; যেমন – দর্জি/দরজি, পাদ্রি/পাদরি, পাল্টা/পালটা, বল্গা/বলগা ইত্যাদি শব্দে বর্ণ সংযুক্ত বা বিযুক্ত থাকার কারণে উচ্চারণ-ভিন্নতা তৈরি হয়নি। ফলে, যুক্তবর্ণের উচ্চারণ আলাদা করে শিশু শিক্ষার্থীদের শেখানোর প্রয়োজন নেই। তবে, ফলাচিহ্নের উচ্চারণ বিশেষভাবে শেখানো দরকার। কেননা, যুক্তবর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ফলাচিহ্নগুলো উচ্চারণে বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণ করে: কখনো কখনো ফলাচিহ্ন রূপে যুক্ত ব্যঞ্জনটি উচ্চারিত হয় না; আবার কখনো কখনো সেটি যে বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেটিকে দ্বিত্ব করে। যেমন:

৬.১ ব-ফলা

ক. শুরুতে অনুচ্চারিত থাকে; যেমন – স্বাধীন [শাধিন্]।

খ. পরে থাকলে সংশ্লিষ্ট বর্ণ দুবার উচ্চারিত হয়; যেমন – বিশ্ব [বিশ্‌শো]।

৬.২ ম-ফলা

ক. শুরুতে অনুচ্চারিত থাকে (কিংবা সামান্য অনুনাসিক হয়); যেমন – স্মরণ [শরোন্/শঁরোন্]।

খ. পরে থাকলে সংশ্লিষ্ট বর্ণ দুবার উচ্চারিত হয় (সামান্য অনুনাসিকতাও যুক্ত হতে পারে); যেমন – আত্মা [আত্‌তা/আত্‌তাঁ]।

৬.৩ য-ফলা

ক. শুরুতে অনুচ্চারিত থাকে কিংবা অ্যা-র মতো উচ্চারিত হয়; যেমন – ন্যূন [নুনো], ব্যয় [ব্যায়্]।

খ. পরে থাকলে সংশ্লিষ্ট বর্ণ দুবার উচ্চারিত হয়; যেমন – বাক্য [বাক্‌কো]।

৬.৪ র-ফলা

ক. শুরুতে থাকলে উচ্চারিত হয়; যেমন – ক্রম [ক্রোম্]।

খ. পরে থাকলেও উচ্চারিত হয় (সংশ্লিষ্ট বর্ণকে দ্বিত্বও করে); যেমন-বক্র [বক্‌ক্রো]।

৭. বাংলা যুক্তবর্ণের তালিকা

বাংলা যুক্তবর্ণের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি; বাস্তবিকই এটি জটিল ও কঠিন কাজ। ধারণাগতভাবে যুক্তবর্ণের সংখ্যা অনেক, কম্পিউটারের কিবোর্ড ব্যবহার করেও অনেক যুক্তবর্ণ তৈরি করা যায়; কিন্তু ভাষায় সেগুলোর প্রয়োগ আছে কি না, তা নির্ধারণ করা সহজ নয়। এক অজ্ঞাতনাম লেখক জানাচ্ছেন, এগারো স্বরবর্ণ আর সাঁইত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগে বাংলায় ৪৪৭টি যুক্তবর্ণ তৈরি হয় (অজ্ঞাতনাম, ১৯৮৪: ৫১৪)। আবার, ফেরদাউস খান উল্লেখ করেছেন, বাংলায় যুক্তাক্ষর সম্বলিত মোট শব্দসংখ্যা ৯ হাজার ২৪৪ (খান, ১৯৮৪: ৫৮৬)। জামিল চৌধুরী যুক্তবর্ণের একটি তালিকা দিয়েছেন (চৌধুরী, ১৯৯০: ১১৯-১২৩), যেটি নিচে দেখানো হলো। এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ ধরে নিলে ভুল হবে; কারণ এখানে রেফযুক্ত ব্যঞ্জনকে মাত্র একটি ঘরে দেখানো হয়েছে; আর ক-এর সঙ্গে বিভিন্ন কারচিহ্নের ব্যবহার দেখানো হলেও অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারচিহ্নের সংযোগ দেখানো হয়নি।

ক+অ	= ক	ড+ম	= ড্ম	ব+ধ	= ব্ধ
ক+আ	= কা	ড+য	= ড্য	ব+ব	= ব্ব
ক+ই	= কি	ড+র	= ড্র	ব+য	= ব্য
ক+ঈ	= কী	ড়+গ	= ড়্গ	ব+র	= ব্র
ক+উ	= কু	ঢ+য	= ঢ্য	ব+ল	= ব্ল
ক+ঊ	= কূ	ঢ+র	=ঢ্র	ভ+য	= ভ্য
ক+ঋ	= কৃ	ণ+ট	= ণ্ট	ভ+র	= ভ্র
ক+এ	= কে	ণ+ঠ	= ণ্ঠ	ম+ন	= ম্ন
ক+ঐ	= কৈ	ণ+ড	= ণ্ড	ম+প	= ম্প
ক+ও	= কো	ণ+ড+য	= ণ্ড্য	ম+প+র	= ম্প্র
ক+ঔ	= কৌ	ণ+ড+র	= ণ্ড্র	ম+ফ	= ম্ফ
ক+ক	= ক্ক	ণ+ঢ	= ণ্ঢ	ম+ব	= ম্ব
ক+ট	= ক্ট	ণ+ণ	= ণ্ণ	ম+ভ	= ম্ভ
ক+ত	= ক্ত	ণ+ব	= ণ্ব	ম+ভ+র	= ম্ভ্র
ক+ত+র	= ক্ত্র	ণ+ম	= ণ্ম	ম+ম	= ম্ম
ক+ন	= ক্ন	ণ+য	= ণ্য	ম+য	= ম্য
ক+ব	= ক্ব	ত+ত	= ত্ত	ম+র	= ম্র
ক+ম	= ক্ম	ত+ত+ব	= ত্ত্ব	ম+ল	= ম্ল

ক+য	= ক্য	ত+থ	= ত্থ	য+য	= য্য
ক+র	= ক্র	ত+ন	= ত্ন	র+ ক, খ...	= র্ক, র্খ...
ক+ল	= ক্ল	ত+ব	= ত্ব	ল+ক	= ল্ক
ক+ষ	= ক্ষ	ত+ম	= ত্ম	ল+গ	= ল্গ
ক+ষ+ণ	= ক্ষ্ণ	ত+ম+য	= ত্ম্য	ল+ট	= ল্ট
ক+ষ+ব	= ক্ষ্ব	ত+য	= ত্য	ল+প	= ল্প
ক+ষ+ম	= ক্ষ্ম	ত+র	= ত্র	ল+ব	= ল্ব
ক+ষ+য	= ক্ষ্য	ত+র+য	= ত্র্য	ল+ম	= ল্ম
খ+য	= খ্য	থ+ব	= থ্ব	ল+য	= ল্য
খ+র	= খ্র	থ+য	= থ্য	ল+ল	= ল্ল
গ+ণ	= গ্ণ	থ+র	= থ্র	শ+চ	= শ্চ
গ+ধ	= গ্ধ	দ+গ	= দ্গ	শ+ছ	= শ্ছ
গ+ন	= গ্ন	দ+ঘ	= দ্ঘ	শ+ন	= শ্ন
গ+ন+য	= গ্ন্য	দ+দ+ব	= দ্দ্ব	শ+ব	= শ্ব
গ+ব	= গ্ব	দ+ধ	= দ্ধ	শ+ম	= শ্ম
গ+ম	= গ্ম	দ+ধ+ব	= দ্ধ্ব	শ+য	= শ্য
গ+য	= গ্য	দ+ব	= দ্ব	শ+র	= শ্র
গ+র	= গ্র	দ+ব+য	= দ্ব্য	শ+ল	= শ্ল
গ+র+য	= গ্র্য	দ+ভ	= দ্ভ	ষ+ক	= ষ্ক
গ+ল	= গ্ল	দ+ম	= দ্ম	ষ+ক+র	= ষ্ক্র
ঘ+ন	= ঘ্ন	দ+য	= দ্য	ষ+ট	= ষ্ট
ঘ+য	= ঘ্য	দ+র	= দ্র	ষ+ট+য	= ষ্ট্য
ঘ+র	= ঘ্র	দ+র+য	= দ্র্য	ষ+ঠ	= ষ্ঠ
ঙ+ক	= ঙ্ক	ধ+ন	= ধ্ন	ষ+ঠ+য	= ষ্ঠ্য
ঙ+ক+ত	= ঙ্ক্ত	ধ+ব	= ধ্ব	ষ+ণ	= ষ্ণ
ঙ+ক+য	= ঙ্ক্য	ধ+ম	= ধ্ম	ষ+ণ+য	= ষ্ণ্য
ঙ+ক+ষ	= ঙ্ক্ষ	ধ+য	= ধ্য	ষ+প	= ষ্প
ঙ+খ	= ঙ্খ	ধ+র	= ধ্র	ষ+ফ	= ষ্ফ
ঙ+গ	= ঙ্গ	ন+ত	= ন্ত	ষ+ব	= ষ্ব
ঙ+গ+য	= ঙ্গ্য	ন+ত+ব	= ন্ত্ব	ষ+ম	= ষ্ম

ঙ+ঘ	= ঙ্ঘ	ন+ত+য	= ন্ত্য	ষ+ম+য	= ষ্ম্য
ঙ+ঘ+য	= ঙ্ঘ্য	ন+ত+র	= ন্ত্র	ষ+য	= ষ্য
ঙ+ঘ+র	= ঙ্ঘ্র	ন+ত+র+য	= ন্ত্র্য	স+ক	= স্ক
ঙ+ম	= ঙ্ম	ন+থ	= ন্থ	স+ক+র	= স্ক্র
চ+চ	= চ্চ	ন+দ	= ন্দ	স+খ	= স্খ
চ+ছ	= চ্ছ	ন+দ+ব	= ন্দ্ব	স+ত	= স্ত
চ+ছ+ব	= চ্ছ্ব	ন+দ+য	= ন্দ্য	স+ত+য	= স্ত্য
চ+ছ+র	= চ্ছ্র	ন+দ+র	= ন্দ্র	স+ত+র	= স্ত্র
চ+ঞ	= চঞ	ন+ধ	= ন্ধ	স+থ	= স্থ
চ+ব	= চ্ব	ন+ধ+য	= ন্ধ্য	স+থ+য	= স্থ্য
চ+য	= চ্য	ন+ধ+র	= ন্ধ্র	স+ন	= স্ন
জ+জ	= জ্জ	ন+ন	= ন্ন	স+প	= স্প
জ+জ+ব	= জ্জ্ব	ন+ন+য	= ন্ন্য	স+প+র	= স্প্র
জ+ঝ	= জ্ঝ	ন+ব	= ন্ব	স+ফ	= স্ফ
জ+ঞ	= জ্ঞ	ন+ম	= ন্ম	স+ব	= স্ব
জ+ব	= জ্ব	ন+য	= ন্য	স+ম	= স্ম
জ+য	= জ্য	প+ট	= প্ট	স+য	= স্য
জ+র	= জ্র	প+ত	= প্ত	স+র	= স্র
ঞ+চ	= ঞ্চ	প+ন	= প্ন	স+ল	= স্ল
ঞ+ছ	= ঞ্ছ	প+প	= প্প	হ+ণ	= হ্ণ
ঞ+জ	= ঞ্জ	প+য	= প্য	হ+ন	= হ্ন
ঞ+ঝ	= ঞ্ঝ	প+র	= প্র	হ+ব	= হ্ব
ট+ট	= ট্ট	প+ল	= প্ল	হ+ম	= হ্ম
ট+ব	= ট্ব	প+ল+য	= প্ল্য	হ+ম+য	= হ্ম্য
ট+ম	= ট্ম	প+স	= প্স	হ+য	= হ্য
ট+য	= ট্য	ফ+য	= ফ্য	হ+র	= হ্র
ট+র	= ট্র	ফ+র	= ফ্র	হ+ল	= হ্ল
ট+র+য	= ট্র্য	ব+জ	= ব্জ		
ড+ড	= ড্ড	ব+দ	= ব্দ		

৮. মধ্যযুগের পুথিতে যুক্তবর্ণ

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া মনে করেন, যুক্তবর্ণগুলো একই যুগে একই সময়ে গঠিত হয়নি, বরং বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত হয়েছে। হাতে-লেখা পুথি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রাচীন পুথিতে একই যুক্তবর্ণের একাধিক আদলও লক্ষ করেছেন। এ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কালে কালে একই যুক্তবর্ণের একাধিক রূপও চালু ছিল। আর, ক্রমান্বয়ে যেটি প্রাচীনতর সেটি বিলুপ্ত হয়েছে; অপেক্ষাকৃত নতুন যুক্তবর্ণের আদলগুলো প্রচলিত থেকে গেছে। কোনো কোনো যুক্তবর্ণের প্রাচীনতর আদল বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে; আধুনিক বাংলা লিপিতে সেগুলোর প্রবেশ ঘটেনি। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, জ্ঞ, হ্র, কৃ ইত্যাদি যুক্তবর্ণের প্রাচীন আকৃতি আধুনিক বাংলা লিপিতে এখন আর প্রচলিত নেই। (মিয়া, ১৯৯৪: ১৯৯)

শাহজাহান মিয়া বলেন, অশোকলিপিতে অধিকাংশ যুক্তবর্ণের অন্তর্নিহিত বর্ণগুলোকে স্পষ্ট চেনা যায়। আদি বাংলালিপির নির্দশন অনেক শিলালেখতেও যুক্তবর্ণস্থিত বর্ণগুলোকে স্পষ্ট চেনা যায়। তাঁর মতে, পরবর্তীকালে দ্রুতলিখন প্রবণতায় সেগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে (মিয়া, ১৯৯৪: ১৯৮)। তবে, চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, হাতে-লেখা পুথিতে এমন কিছু শব্দ পেয়েছেন শাহজাহান মিয়া, যেগুলো লিপিগত বা আকৃতিগত বিচারে একেকটি যুক্তবর্ণই বটে, কিন্তু প্রকৃতিগত নিরিখে এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো একাক্ষরের স্তূপ। তিনি বিশেষভাবে এ রকম তিনটি উদাহরণ দেখিয়ে এর উৎপত্তির কারণ এবং পরবর্তী সময়ে এর অবলুপ্তির কারণ নির্দেশ করেছেন। কৃষ্ণ, প্রভু, কুণ্ড শব্দগুলো হস্তলিপি সংকোচনের মাধ্যমে কালক্রমে ও ধাপে ধাপে 'একীভূত শব্দ' গঠন করেছে (মিয়া, ১৯৯৪: ২৪) –

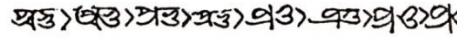

শাহজাহান মিয়ার মতে, লিপি-বিবর্তনের বিবিধ কারণের মধ্যে লেখার দ্রুততা বা হাত না-তুলে লেখার স্বাভাবিক প্রবণতা একটি। এই প্রবণতা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কিছু কারণ দেখানো হয়েছে একীভূত শব্দ গঠনের উপায় হিসেবে।

শাহজাহান মিয়া আরও দেখিয়েছেন, ও (ও, তু, ত্ত) কিংবা ক্ত (ক্ত) এমনকি 'উ' বা 'ভু' প্রভৃতি বর্ণের সাদৃশ্য থাকায় লিপিকর কখনও কখনও বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন (মিয়া, ১৯৯৪: ১২৭)। যেমন:

উপদেশ –
উত্তরিলা –

ওপরে দেখা যাচ্ছে, হস্তলিপিতে উ এবং ত্ত বর্ণের সাদৃশ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরির জন্য লিপিকর ত্ত যুক্তবর্ণের শীর্ষে রেফ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য যুক্তবর্ণে রেফ ব্যবহারের সাধারণ প্রবণতাও ছিল।

শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ১২৮) হস্তলিখিত পুথিতে কয়েকটি সাধারণ বর্ণের সঙ্গে যুক্তবর্ণের তুলনা করেও দেখিয়েছেন:

১	স্ব	খ	
২	তু	ও	
৩	ব্ব	ঝ	

মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের বর্ণনায় এই তালিকা অবশ্য একটু দীর্ঘ; তিনি হাতে-লেখা পুথি থেকে নমুনা নিয়ে দেখিয়েছেন, প্রচুর সংখ্যক বর্ণ ও যুক্তবর্ণ অনুরূপ আকৃতির ছিল (কাইউম, ১৯৮৬: ২১৩)। যেমন:

ঈ, কু, গ্ন, ঙ্গ, দ্দ – একরূপ
ও, তু, ত্ত – একরূপ
কু, হু – অনেকটা একরূপ
খ, সু – অনেকটা একরূপ
কৃ, হৃ – একরূপ
ক্র,হ্র – একরূপ
দ্ম, নু, ন্ধ, ন্ন, স্ব – অনেকটা একরূপ
ত্ব, দু, দ্ব – অনেকটা একরূপ
দৃ, ভৃ – প্রায় একরূপ
ন্দ, ন্ন – একরূপ
মু, স্ব, যু, সু – প্রায় একরূপ
সু, স্ব, স্ম – প্রায় একরূপ

শাহজাহান মিয়া দেখিয়েছেন, কীভাবে উ-কার চিহ্নের এবং ণ-ফলার আকৃতি মধ্যযুগে বদলে গিয়েছে (মিয়া, ১৯৯৪: ১৭৪, ১৭৬, ১৮৫) –

১. কিন্তু কিন্ত্র, জন্তু জন্ত্র	৩ : উ-কার চিহ্নরূপে ব্যবহার
২. কৃষণ > কৃষ্ণ, পুর্ন্ন পুন্ত্ত	ও : ণ-ফলা রূপে ব্যবহার

ওপরের প্রথম উদাহরণে দেখানো ন+ত+উ রূপের সংযুক্ত রূপ 'ন্ত্র' এখনও ফন্টে রয়ে গেছে; কিন্ত হাতের লেখায় তা স্পষ্ট হয়ে 'ন্তু' আকার ধারণ করেছে। দ্বিতীয় উদাহরণ

সাক্ষ্য দেয়, 'ষ্ণ' যুক্তবর্ণের ষ এবং ণ বর্ণদুটি আগে স্পষ্ট রূপেই ছিল; পরে ণ বর্ণটি ঞ-র ডানের পুঁটলির আকার ধারণ করেছে।

মধ্যযুগের পুথিতে যুক্তবর্ণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। মিয়া (১৯৯৪: ৯২-৯৭) ও হক (২০০২: ৬২-৬৪) অনুসারে নিচে নমুনা দেখানো হলো।

১. উ-কার বোঝাতে ব-ফলার ব্যবহার:

দ্ব (দু) – 'কৃষ্ণ কথা ষুন নর ঘুচিবে দ্বর্গতি।' পৃ ২৩ক, ৬০৫৩ সং ঢাবিপু[১]
স্ব (নু) – 'টংকারিয়া ধস্ব গুন এড়ে দিব্ব বান।' পৃ খ, ৫৭৪৬ সং ঢাবিপু

২. দ্বিত্ব নির্দেশে ব-ফলার ব্যবহার:

ত্ব (ত্ত) – 'ইসত হাসিয়া তবে দিলেন উত্বর ॥' পৃ ১১খ, ৫৯৪৭ সং ঢাবিপু
ন্ব (ন্ন) – 'ব্রাহ্মনে বোলেন আমি অন্ব বিনে মরি।' পৃ ২খ, ৬০৪২ সং ঢাবিপু

৩. দ্বিত্ব নির্দেশে ম-ফলার ব্যবহার:

দ্ম (দ্দ < দ্য) – 'পঞ্চশব্দে বাদ্ম বাজে আনন্দ মঙ্গলে।' পৃ ৭৬ক ৬০৪১ সং ঢাবিপু
স্ম (শ্শ < স্ব) – 'বাল বৃদ্ধ জুবা গৃহী জতেক তপস্মি ॥' পৃ ৫খ, ৬০৯৫ সং ঢাবিপু

৪. দ্বিত্ব নির্দেশে য-ফলার ব্যবহার:

গ্য (গ্গ < জ্ঞ) – 'পাইআ পিতার আগ্যা আইলু তুমা কাছে।' পৃ ১৭ক, ২৮০৭ সং ঢাবিপু
ত্য (ত্ত < ত্ব) – 'পুরন্দরে অহল্লার ভাঙ্গিল সতিত্য।' পৃ ৬৬খ, ৬০৪১ সং ঢাবিপু

৫. দ্বিত্ব নির্দেশে বিসর্গের ব্যবহার:

কুঃকুর (কুক্কুর) – 'কুঃকুর রহিলা সিবানন্দ দুঃখী হৈলা।' পৃ ১খ, ৬৩১৪ সং ঢাবিপু
আঃছাদিয়া (আচ্ছাদিয়া) – 'তুমগুনে আঃছাদিয়া করহ সংহার ॥' পৃ ১১৭খ, ৫৮২৬ সং ঢাবিপু

এখানে লক্ষণীয়, যুক্তবর্ণের বিকল্প হিসেবে বিসর্গের ব্যবহার হচ্ছে; যেমন, 'কুক্কুর' শব্দের পরিবর্তে 'কুঃকুর', 'আচ্ছাদিয়া' শব্দের পরিবর্তে 'আঃছাদিয়া' ইত্যাদি।

আবদুল কাইউম লিখেছেন, প্রাচীন বাংলা লিপিতে কোনো কোনো যুক্তব্যঞ্জনে ফলাচিহ্নরূপে কৌণিক (^) চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। কৌণিক চিহ্নগুলো বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জনবর্ণ নির্দেশক চিহ্ন। প্রাথমিক অবস্থায় এগুলো ছিল অবিকৃত বা পূর্ণ অক্ষর। কালক্রমে তা সংযুক্তির সুবিধার্থে বা সংক্ষিপ্তকরণের ফলে কৌণিক চিহ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। এরপর তিনি নমুনা তুলে ধরেছেন:

১. ন-ফলা রূপে ব্যবহার; যেমন: ক্ন, খ্ন, গ্ন, ঘ্ন, ত্ন, ধ্ন, প্ন, ম্ন, শ্ন।
২. গ-ফলা রূপে ব্যবহার: গ, ঙ, ড় প্রভৃতি বর্ণের নিচে।
৩. জ-ফলা রূপে ব্যবহার; যেমন: জ্জ, ঞ্জ।
৪. দ-ফলা রূপে ব্যবহার; যেমন: দ্দ, ন্দ, ব্দ। (কাইউম, ১৯৮৬: ২১৪-২১৫)

প্রাচীন বাংলা পুথিতে রেফ (́)-এর ব্যবহারেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। শাহজাহান মিয়ার মতে, মূলত দুভাবে রেফ-এর ব্যবহার হয়েছে: বিশুদ্ধ শব্দের অঙ্গীভূত রূপে এবং বিকৃতিজাত রূপে। যেমন, 'বিধর্মজনের এহি কর্ণে জন্মে সাল।' (পৃ ৪৭খ, ৩৪ সং বাএপু[২]) – এখানে 'বিধর্ম', 'কর্ণ' – শব্দ দুটিতে রেফচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে বিশুদ্ধ শব্দের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে। আবার, শব্দের আদিব্যঞ্জনের ঋ-কার পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী বর্ণের বা যুক্তবর্ণের ওপরে রেফ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়; যেমনঃ নৃপ > নির্প, মৃত্যু > মির্তু, মৃগ > মির্গ, সৃজন > সির্জন। অনেক ক্ষেত্রে শব্দের আদিব্যঞ্জনের ঋ-কার বা র-ফলা বিদ্যমান থেকেই পরবর্তী বর্ণে বা যুক্তবর্ণে অতিরিক্ত একটি রেফ ব্যবহৃত হয়েছে; যেমনঃ নৃপ > নৃর্প বা ন্রির্প, বৃদ্ধ > বৃর্দ্ধ, মৃগয়া > মৃর্গয়া, সৃজন > শ্রির্জন, বৃক্ষ > বৃর্ক্ষ, ব্রহ্মা > ব্রর্হ্মা, দর্পণ > দ্রর্পণ। (মিয়া, ১৯৯৪: ১)

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের একটি পুথির নমুনা তুলে ধরেছেন মোজাম্মিল হক। বাংলা বর্ণমালার সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণে রেফ ব্যবহারের যে তালিকা তিনি দেখিয়েছেন (হক, ২০১২: ১৫৮), তাতে মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রে বর্ণ বা যুক্তবর্ণের ওপরে রেফ ব্যবহৃত হয়েছে ক্যালিগ্রাফি হিসেবে। আহমদ শরীফ ও মুহম্মদ এনামুল হকের মৌখিক অভিমতের সূত্র ধরে মুহম্মদ শাহজাহান মিয়াও স্বীকার করেছেন, রেফচিহ্ন একধরনের ক্যালিগ্রাফি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে চিহ্নগুলোকে শুধুমাত্র ক্যালিগ্রাফি বলে ধরে নেয়া সঙ্গত মনে করেন না মিতালী ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এটা যদি ক্যালিগ্রাফি হতো, তবে তা বাংলা হরফে লেখা সমসাময়িক সংস্কৃত পুথিতেও দেখা যেত (ভট্টাচার্য, ২০১০: ২০)।

লিপিকরণগণ যুক্তব্যঞ্জন বোঝাতে রেফচিহ্ন ব্যবহার করতেন বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল কাইউমের মন্তব্যটি বিবেচনায় নেয়া যায়। সেটি হলো, এ ধরনের রেফচিহ্ন যুক্তবর্ণ-নির্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের ওপরে রেফচিহ্নের প্রয়োগ ঘটেছে; যেমনঃ 'তুমি সে আমার প্রাণ তুমি সে সর্ম্পদ।' (পৃ ১১খ, ২৮১৯ সং ঢাবিপু)। তাছাড়া, প্রস্বর নির্দেশের জন্য এ ধরনের রেফচিহ্ন সংশ্লিষ্ট পুথিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে বলে তিনি মনে করেন।

৯. যুক্তবর্ণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য বিবেচনা

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বইটি ইংরেজি ভাষায় লিখিত; তবে এতে বাংলা বর্ণ ও উদাহরণগুলো বাংলা মুদ্রাক্ষরে ছাপা হয়। এই মুদ্রণে প্রথমবারের মতো 'বিচল হরফ' প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।[৩] ধাতুর ব্লকে ঢালাই-করা একই আকৃতির বর্ণ বাংলা ছাপার হরফে তুলনামূলকভাবে স্থায়ী, বৈষম্যহীন রূপ এনে দেয়। তবে প্রথম দিককার হরফগুলো খুব সুদৃশ্য ও পরিণত ছিল না। ইংরেজির তুলনায় বাংলা হরফের আকার ছিল বেশ বড়। ইউরোপে অবশ্য এর প্রায় তিনশ বছর আগেই বিচল হরফে ছাপার প্রযুক্তি শুরু হয়েছিল। (রাব্বি, ২০০২: ৭১)

প্রফুল্লকুমার পান লিখেছেন, হ্যালহেড যে লিপি তৈরি করে ছাপাখানায় ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেই লিপি ওই সময়ে প্রচলিত ছিল বাংলা হাতে-লেখা পুথিতে। হ্যালহেড বাংলা ভাষায় লেখা অনেক লিপি পর্যবেক্ষণ করেন এবং যে লিপিটি ওই সময়ে বহুল প্রচলিত ছিল, সেই লিপির অনুকরণে তাঁর গ্রন্থ ছাপান (পান, ২০০৬: ৯)। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ ঠিক রাখারও চেষ্টা করেন। প্রফুল্লকুমার আরও লিখেছেন, ওইসময় ছাপাখানায় বাংলা বর্ণের বা যুক্তবর্ণের যে আদল বা আকার ছিল, পরে সেগুলোর আকার পুরোপুরি অপরিবর্তিত থাকেনি। যেমন: র-এর সঙ্গে উ যুক্ত হলে যে আদলটি নেয় তা এ রকম: 'রু'। হ-এর সঙ্গে উ যুক্ত হলে তা লেখা হয় 'হু' এবং গ-এর সঙ্গে এই উ যুক্ত হলে লেখা হয় 'গু'। আবার হ্যালহেডের গ্রন্থে দ-এর সঙ্গে উ যোগ করে লেখা হয়েছে এভাবে: 'দ্ব' (দ+উ)। আবার ত-এর সঙ্গে উ যোগ করে হ্যালহেডের আমলে লেখা হতো: 'ত্ত' (ত+উ)। এই 'ত্ত' সংযুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের আদলটি ছাপাখানায় প্রায় বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত লেখা হয়ে এসেছে। পরে উ-কারের চিহ্ন অন্তত হাতের লেখায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পষ্ট রূপ (ু) ধারণ করেছে। (পান, ২০০৬: ২৮-২৯)

প্রফুল্লকুমার পান কয়েকটি সংযুক্তবর্ণের আদলের কিছু বিবর্তন দেখিয়েছেন (পান, ২০০৬: ৩০-৩১):

ঙ্গ (ঙ+গ): আগে ঙ এবং গ বর্ণের যুক্তরূপ স্বচ্ছ ছিল; পরে অস্বচ্ছ রূপ ধারণ করে –

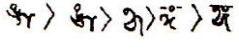

দ্ধ (দ+ধ): আগে এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটি লেখা হতো এভাবে: দ্ধ। তখন 'দ' বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় ধ-এর কাঁধে আঁকড়ি থাকত না; শুধু ব-এর মতো অংশটি 'দ'-এর নিচে যুক্ত হতো। মধ্যযুগের পুথিতে উ-কার বোঝাতে বর্ণের নিচে ব-ফলা ব্যবহার করতে দেখা যায়; যেমন: দ্ব (দু), ন্ব (নু), ত্ব (তু) ইত্যাদি। এর ফলে, 'দ্ব' যুক্তব্যঞ্জনের রূপটি দ্বিধা তৈরি করতো – এটি 'দ+উ' না 'দ+ধ' নির্দেশক, তা বোঝা যেত না। এখন, কম্পিউটার ফন্টে ধ-এর কাঁধের আঁকড়ি ব-এর ডান দিকে ঘুরে বসে: দ্ধ।

স্থ (স+থ): আগে স এবং থ বর্ণের যুক্তরূপ বোঝাতে স-এর নিচে সোজাসুজি থ বসানো হতো। এরপর 'থ' সরাসরি নিচে না বসে একটু ডানে সরে যায়। পরে স-এর নিচে থ বর্ণটি হ-এর মতো আকার নিয়ে 'স্থ' হয়:

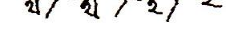

১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উইলিয়াম কেরি ও উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন ছাপাখানা বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা হরফের চেহারার উন্নতি হতে থাকে। উনিশ শতকের তিনের দশকে বাংলা ছাপার চেহারা অনেকখানি পালটে যায়। ১৮৩১ সালে ভিনসেন্ট ফিগিন্স সম্ভবত প্রথম বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেন (www.wikipedia.org/wiki/Bangla_alphabet)। এ সময়কার বাংলা যুক্তবর্ণের বৈশিষ্ট্য:

- ব্যঞ্জনবর্ণের ডানের দাগের সাথে য-ফলা মিলিয়ে কমলার কোয়ার মতো বাঁকানো চেহারা দেয়া হয়। এগুলো এখনও দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে।
- 'তু' যুক্তাক্ষরটি স্বচ্ছ রূপ পায়। অর্থাৎ 'ত'-এর নিচে 'ু' পৃথক কারচিহ্ন হিসেবে বসে।
- 'স্থ' (স+থ) যুক্তাক্ষরটি হ্যালহেডের সময়ে স-এর নিচে পরিষ্কার থ লিখে দেখানো হতো; পরে থ বর্ণটি হ-এর মতো হয়। ফলে যুক্তাক্ষরটি অস্বচ্ছ রূপ ধারণ করে। এ রকম আরও বহু যুক্তাক্ষরের অস্বচ্ছ রূপ উনিশ শতকের প্রথম ভাগে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের হরফ লেখায় সমস্যা বা বিভ্রাট নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন রামমোহন রায়। বাংলা ভাষাকে সরল ও সহজ করার প্রচেষ্টা তিনি দীর্ঘদিন ধরে চালিয়েছিলেন। যুক্তবর্ণ লেখার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'আপন ২ স্বরূপের অবিনাশে অক্ষর দ্বয়ের সংযোগ করলেও হয়' (*গৌড়ীয় ব্যাকরণ* থেকে উদ্ধৃত, পান, ২০০৬: ৩২)। তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যুক্তব্যঞ্জন লেখার ব্যাপারে ব্যঞ্জন-হরফের প্রকৃত স্বরূপ নষ্ট হোক, তা তিনি চাননি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ সালে ছাপাখানা খোলেন এবং বাংলা হরফের স্বচ্ছতা ও সমতা বিধানের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেন:

- য-ফলাকে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত করে কমলার কোয়ার মতো না লিখে আলাদা করে লেখার ধারা চালু করেন। ফলে সর্বত্র য-ফলার আকার একরকম হয়।
- বিদ্যাসাগরের আগে ঋ-কার ব্যঞ্জনের তলায় বিভিন্ন রূপে বসত। বিদ্যাসাগর প্রথম ব্যঞ্জনের নিচে পরিষ্কারভাবে 'ৃ' চিহ্নটি বসিয়ে লেখা চালু করেন। একইভাবে হ্রস্ব-উ কারের জন্য 'ু' লেখা চালু করেন। 'হ্ন' বা হ-এর পাশে ঋ অবশ্য এখনও চালু আছে।

বিদ্যাসাগরের সংস্কারও পূর্ণাঙ্গ ছিল না। অনেক অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনের চিহ্ন অস্বচ্ছই রয়ে যায়। যেমন: 'তু' লিখতে ত-এর নিচে উ-কার দিয়ে লেখা হলেও 'ন্ত্র', 'স্ত্র' যুক্তাক্ষরগুলোতে পুরনো অস্বচ্ছ রূপটিই থেকে যায়।

ইউরোপে লাইনোটাইপ মেশিনে ছাপানোর প্রচলন হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। ১৯৩৫ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকায়* লাইনোটাইপ প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলা মুদ্রণের যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই নতুন টাইপ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, রাজশেখের বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন, সুশীল ভট্টাচার্য প্রমুখ। লাইনোটাইপ মেশিনে ছিল আড়াইশোর মতো চিহ্ন রাখার ব্যবস্থা। বিদ্যাসাগরীয় পদ্ধতিতে হরফের সংখ্যা ছিল প্রচুর। 'করন টাইপ'[৪] পদ্ধতিতে এই সংখ্যা কমা সত্ত্বেও প্রায় ৬০০-র মতো হরফের ব্লক প্রয়োজন হতো। রাজশেখর বসুর পরামর্শে 'আনন্দবাজার প্রকাশনা সংস্থা'র সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা হরফের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি কারচিহ্নগুলো সবক্ষেত্রে একই আকারের করেন এবং এগুলো ব্যঞ্জন বা যুক্তব্যঞ্জনের নিচে বা ওপরে না বসিয়ে সামান্য ডানে বা বাঁয়ে সরিয়ে আলাদা অক্ষর হিসেবে ছাপার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি অনেক যুক্তব্যঞ্জনের একই উপাদান আলাদা করে সেটির হরফ তৈরি করেন; ফলে যুক্তব্যঞ্জন ছাপানোতে হরফের সংখ্যা কমে আসে। সুরেশচন্দ্র বাংলা হরফের সংখ্যাকে চাবির ডালায় ১২৪টি এবং বিবিধ আরও ৫০টিতে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। তাঁর যুক্তবর্ণে ব্যঞ্জনগুলোও অনেক স্পষ্ট হয়। (রাব্বি, ২০০২: ৭৭; Ross 1999: 138)

একসঙ্গে একাধিক হরফের ব্যবহার লাইনোটাইপের একটি বড় সমস্যা; যেমন: ক্ত > ক্ত; রু > র ু; ন্ত > ন্‌ত; হৃ > হ ৃ; প্র > প ্র; ন্ড > ন্‌ড; ন্ন > ন্‌ন; হ্ম > হ্‌ম। তাছাড়া বাংলা মুদ্রণের সবক্ষেত্রেই যদি লাইনোর ব্যবহার চালু হয়ে যেত, তবে বাংলা হরফের একরূপতা রক্ষিত হতো। কিন্তু এর পরিবর্তে হাতে-বসানো টাইপ, লাইনোফেস ও লাইনো ইত্যাদি মিলে বাংলা হরফে নানা রূপের পাশাপাশি কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। লাইনো টাইপ ছাড়া পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত মনোটাইপ বা লাইনোফেস টাইপে যে যুক্তব্যঞ্জন ছাপা হয়, সেখানেও পার্থক্য দেখা দেয়। ইনটার-টাইপ যন্ত্রে বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের চেহারা আরও বদলে যায়; সেখানে প্র ছাপা হয়: প্র। (ভট্টাচার্য, ২০১০: ৭৮-৭৯)

১৩৩৯ সালের *প্রবাসী*র পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে অজরচন্দ্র সরকারের 'বাংলা টাইপ ও কেস' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সরকার (২০০৭: ৩) সেখানে লেখেন, বাংলা টাইপকেসের মধ্যে এমন কিছু যুক্তাক্ষর রয়েছে, যেগুলোর প্রয়োগ অতি বিরল অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; যেমন – দধৃ ধ্ন ন্ধ্ব প্ন ঝ্ঝ ব্ঢ ব্ল ব্লু স্ত্ব ইত্যাদি। এগুলোকে তিনি বাদ দিতে বলেছেন। এমনকি, 'গ্ন' যুক্তাক্ষরকেও বাদ দেয়ার কথা বলছেন। তখন 'ভগ্ন' লেখা হবে 'ভগ্‌ন' আর 'রুগ্ন' লেখা হবে 'রুগ্‌ণ'। অনুরূপভাবে তিনি মনে করেন, বাগ্দান, বাগ্দেবী, বাগ্দত্তা, দিগ্দর্শন, দিগ্বলয় ইত্যাদি না লিখে বাগ্‌দান, বাগ্‌দেবী, বাগ্‌দত্তা, দিগ্‌দর্শন, দিগ্‌বলয় ইত্যাদি লেখা যেতে পারে। তবে, তিনি মনে করেন, ্ম ্ণ ্য ্র ্ল ইত্যাদি ফলাচিহ্নকে বাদ দেয়ার উপায় নেই। এরপর অজরচন্দ্র একটা তালিকা দিয়েছেন সেসব টাইপের – যেগুলোর মূলবর্ণ অস্পষ্ট:

ক্ত ক্রু	২
গু গ্ধ	২
ঙ্গ	১
জ্ত	১
ঞ্ত	১
ট্রু	১
ঙু	১
ত্ত থ্থ ত্র ত্ত্র ত্রু ত্রূ	৬
দ্ধ দ্রু, দ্রূ	৩
ধ্রু, ধ্রূ	২
ন্থ ন্ধ ন্তু	৩
প্রু প্রূ	২
ব্ধ ব্রু, ব্রূ	৩
ভ্র ভ্রু ভ্রূ	৩
রু রূ	২
শু শ্রু শ্রূ	৩
ষ্ত	১
স্থ স্তু স্রু স্রূ	৪
হু হ্ন হৃ ক্ষ্ম	৪
ক্ষ	১
মোট:	৪৬

অজরচন্দ্র সরকার মনে করেন, এই ৪৬টি টাইপের রূপ বদল করলে ক্ষতি নেই, বরং শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সুবিধা হবে।

১০. যুক্তবর্ণ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বাংলা বানান ও লিপিপদ্ধতি নিয়ে প্রস্তাব করতে দেখা যায়। এ রকম কিছু প্রস্তাবে যুক্তব্যঞ্জন প্রসঙ্গে কী বলা হয়েছে, এ অংশে উল্লেখ করা হলো।

১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ সরকার মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি 'শহজ বাঙলা' নামে কিছু প্রস্তাব করে (চৌধুরী, ১৯৯৪: দশ)। যুক্তাক্ষর বিষয়ে তাঁদের মত: যুক্তাক্ষর থাকবে না; সংযুক্ত অক্ষর ভেঙে

পাশাপাশি গোটা গোটা বসাতে হবে। রেফ এবং র-ফলা, ন/ণ-ফলা, ল-ফলাসহ কোনো ফলাচিহ্ন থাকবে না; উচ্চারণ অনুসারে ভেঙে লিখতে হবে। উদাহরণ: গল্প, উর্ধ, ব্রুগ্ন, গ্লানী, প্রায়, প্রান, কীন্তু, পদ্দা, বীশ্শ, শুছ্থ, বীদ্দান, চন্দ্র, তর্ক, শুরজ, বীগ্গঁ ইত্যাদি।

১৯৬২ সালে বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার সম্পর্কে বাংলা একাডেমি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপসজ্ঘ গঠন করে। এই উপসজ্ঘের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান এবং সদস্য ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাৎ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গনি, ফেরদাউস খান, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (চৌধুরী, ১৯৭০: ১১০)। এই কমিটি যুক্তাক্ষর বিষয়ে প্রস্তাব করে: কারচিহ্ন যুক্ত হলে ব্যঞ্জনবর্ণের মূল আকৃতির যেন পরিবর্তন না হয়; অর্থাৎ গু, রু, শু, হু, হৃ স্থানে গু, রু, শু, হু, হৃ লিখতে হবে। বর্ণমালা থেকে ঐ, ঔ এবং এদের চিহ্ন ৈ এবং ৌ বাদ যাবে না, তবে বিকল্পে 'অই' এবং 'ওই' লেখা যেতে পারে; যেমন: শৈবাল/শইবাল। বর্ণমালা থেকে ঞ বাদ যাবে, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ স্থানে ন্চ, ন্ছ, ন্জ লিখতে হবে; যেমন: বান্ছা, ঝন্ঝা, ইত্যাদি। জ্ঞ, ক্ষ থাকবে। এগুলো গ্যঁ, ক্খ-এর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হবে এবং এদেরকে 'গ্যঁ' ও 'ক্ষিয়' রূপে পড়তে হবে। বিসর্গ বাদ যাবে; শব্দ-মধ্যবর্তী 'ঃ' স্থানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে; যেমন: দুখ্খ। শব্দান্তের বিসর্গের পরিবর্তে হ্ হবে; যেমন: আহ্ ইত্যাদি। ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে ্র (র-ফলা) এবং র্ (রেফ) থাকবে। যেখানে য-ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বোঝায় সেসব স্থানে য-ফলা রক্ষিত হবে; তবে যেসব স্থানে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়, যেমন – বাহ্য, উহ্য, সেখানে য-ফলা থাকবে না, লেখা হবে: বাজ্ঝ, উজ্ঝ। যুক্তাক্ষরে কোনো অক্ষরের চেহারা পরিবর্তিত হবে না; যেমন: ক্র। দ্বিত্বের জন্য ব-ফলা, ম-ফলা থাকবে না। অন্য যুক্তবর্ণগুলো হসচিহ্ন (্) দিয়ে অথবা গায়ে গায়ে লাগিয়ে প্রত্যেক অক্ষরকে পূর্ণরূপে লিখতে হবে। মুনীর চৌধুরী জানাচ্ছেন, অনেক সদস্যই পরবর্তীকালে ভিন্নমত প্রকাশ করেন এবং কেউই কখনও নিজেদের লেখায় প্রস্তাবিত বানান অনুসরণ করেননি। (চৌধুরী, ১৯৭০: ১১৩)

১৯৬৫ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্য সন্তোষকুমার ঘোষ এবং গৌরকিশোর ঘোষ ইংরেজি শব্দে যুক্তাক্ষর ভাঙার প্রস্তাব করেন। তারা London, Park ইত্যাদি শব্দ বাংলায় লনডন, পারক লেখার প্রস্তাব করেন। এমন বানান 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বেশ কিছুদিন চলে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন করে বানান সংস্কারের চেষ্টা হয় ১৯৭৯ সালে। বাংলা বিভাগের প্রধান অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী, পরেশচন্দ্র মজুমদার ও তুষারকান্তি মহাপাত্রকে নিয়ে একটি সংস্কার-সমিতি গঠন করা হয়। তাঁরা প্রাথমিকভাবে একটি পুস্তিকা তৈরি করেন যেখানে যুক্তব্যঞ্জন বিষয়ে প্রস্তাব ছিল: যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে লেখা যাবে; যেমন: অব্দ, ট্যাক্সি,

বন্ধ, মুক্তি, কিন্চিৎ, সন্চয়, বান্ছা, সন্জয়, বন্টন, লুন্ঠন, মন্ডল। অবশ্য ১৯৮১ এই সংস্কার প্রচেষ্টা স্থগিত হয়ে যায়। (মহাপাত্র, ২০০৫: ৩৫২)

জাতীয় শিক্ষক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালে 'পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতা বিধান' শীর্ষক কর্মশালা করে (চৌধুরী, ১৯৯৪: বারো)। এই কর্মশালায় বিশেষজ্ঞগণ প্রস্তাব করেন: কারচিহ্নের রূপ স্বচ্ছ হবে; যেমন: শুভ, রূপ, হৃদয়। যুক্তব্যঞ্জনও স্বচ্ছ হবে; যেমন: অঙ্ক, স্পষ্ট। কিন্তু যেসব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে, যেমন – ক্ষ, জ্ঞ, হ্ম, সেগুলোর রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঞ্চ, ঞ্ছ, জ্ঞ, ট্র, ট্র, ত্ত, থ্র, ভ্র, হ্ন, হ্ম, ষ্ণ যুক্তবর্ণগুলোর প্রচলিত রূপ অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে থাকে।

১৯৯২ সালে *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* শিরোনামে ঢাকার বাংলা একাডেমি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই বানান কমিটির সভাপতি ছিলেন আনিসুজ্জামান এবং সদস্য হিসেবে ছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জামিল চৌধুরী ও নরেন বিশ্বাস। তাঁদের প্রস্তাবে ছিল: বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তাক্ষর শব্দের আদিতে থাকলে ভাঙা সম্ভব নয়; যেমন: স্টেশন, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়; যেমন: সেপটেম্বর, শেক্স্পিয়র। তাঁরা আরও প্রস্তাব করেন: যুক্তব্যঞ্জন যতদূরসম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে; যেমন: গু, দ্রু, ভ্রু, ভ্রু। ২০১২ সালের *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মের* পরিমার্জিত সংস্করণে যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ রূপের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে বাংলা বানান সংস্কার সংক্রান্ত একটি ভিত্তিপত্র ১৯৮৮ সালে প্রকাশ করে। এই ভিত্তিপত্র তৈরি হয় অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মল দাশ ও পবিত্র সরকারের আলোচনার ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন জনের মতামতের ভিত্তিতে ১৯৯৫ সালে লিপিবিষয়ক বেশ কিছু সুপারিশ করেন তাঁরা: কারচিহ্নের রূপগুলো প্রতিক্ষেত্রে স্বচ্ছ হবে; যেমন: গু, রু, রূ, শু, হু, হূ। বেশ কয়েকটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ বা প্রায়স্বচ্ছ রূপের প্রস্তাব করা হয়; যেমন: ক্ত-এর বদলে ক্ত, ক্র-এর বদলে ক্র, ঙ্গ-এর বদলে ঙ্গ, ঞ্চ-এর বদলে ঞ্চ, ঞ্জ-এর বদলে ঞ্জ, ন্ধ-এর বদলে ন্ধ, ষ্ণ-এর বদলে ষ্ণ, হ্ম-এর বদলে হ্ম। কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জনের প্রচলিত অস্বচ্ছ রূপ বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়; যেমন: জ্ঞ, ক্ষ, ট্র, থ্র, হ্ন। য-ফলা (্য), র-ফলা (্র) এবং রেফ (র্)-এর আকৃতি পরিবর্তনের কোনো প্রস্তাব করা হয়নি। 'ব' ও 'য'-এর উচ্চারণ আলাদাভাবে উচ্চারিত হলে ভেঙে লেখার প্রস্তাব করা হয়েছে; যেমন: উদ্বেগ নয়, উদ্‌বেগ; কিন্তু অন্যক্ষেত্রে আগের মতো থাকবে; যেমন: উদ্যত, উদ্যান।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক স্তরে যুক্তবর্ণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিছু যুক্তবর্ণ অবশ্যই আলাদা গুরুত্বের দাবি রাখে; যেমন: ক্ষ, জ্ঞ, হ্ম।

গুরুত্বের দাবি রাখে ফলাচিহ্নগুলোও; কারণ উচ্চারণে এগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণ করে। তবে স্বচ্ছরূপে ব্যবহৃত হলে ক্ত, ঙ্গ, দ্ধ, ন্ধ ইত্যাদি যুক্তবর্ণ সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর সমস্যা হওয়ার কথা নয়। শিক্ষাক্রমে যুক্তবর্ণের ব্যাপারে লেখা হয়েছে:

	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
শোনা	বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে।	বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে।	যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
পড়া	নির্বাচিত কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জন পড়তে পারবে।	যুক্তব্যঞ্জন পড়তে পারবে।	যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।	যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।
লেখা	নির্বাচিত যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে ও যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে শব্দ লিখতে পারবে।	যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে শব্দ লিখতে পারবে।	যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে শব্দ গঠন করতে ও বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য যুক্তবর্ণের ব্যাপারে যে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। যেমন, 'শোনা'র ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে: 'যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে'; অথচ যুক্তবর্ণের আলাদা ধ্বনি নেই (যেমন: দর্জি/দরজি, পাল্ট/পালটা)। 'বলা'র ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে: 'ব্যবহৃত নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে'; অথচ যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করানোর অনুশীলন পাঠ্যবইয়ে অনুপস্থিত (যেমন: স্নেহ উচ্চারণে ইস্‌নেহো হয়ে যায়)। 'পড়া'র ক্ষেত্রে খুবই সংকীর্ণ চিন্তা করা হচ্ছে: 'নির্বাচিত কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জন পড়তে পারবে'; অথচ যুক্তবর্ণ নিয়ে এত ভাবনারই প্রয়োজন হয় না, যদি স্বচ্ছরূপে সেগুলো ব্যবহৃত হয়। স্বচ্ছরূপে ব্যবহৃত হলে 'লেখা'র ক্ষেত্রেও যুক্তবর্ণ কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। যুক্তবর্ণ স্বচ্ছ করা হলে, যুক্তবর্ণ চেনার পরীক্ষা নেয়ারও প্রয়োজন হবে না।

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বচ্ছ যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়। অথচ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ সব ধরনের যুক্তবর্ণ ব্যবহার করা হয়, কোনো রকম সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন না করেই। পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একই যুক্তবর্ণের একাধিক আকৃতি দেখতে পায় শিক্ষার্থীরা। মনসুর মুসা মনে করেন, শিক্ষার্থীরা যখন পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বই পড়ে কিংবা রাস্তা, সাইনবোর্ড ও চারপাশে লেখা বিভিন্ন অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ দেখে, তখন জটিলতার মুখোমুখি হয় (মুসা, ২০০৭: ৭৬)। কিন্তু বাস্তবতা এই, শিক্ষার্থীর সাধারণ বাংলা পড়ার দক্ষতা তৈরি হওয়ার পর, শব্দে অস্বচ্ছ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতির যুক্তবর্ণ থাকলেও শিক্ষার্থী অন্য বর্ণ ও শব্দের প্রতিবেশ বুঝে বাক্যটি পড়ে ফেলতে পারে। তখন সে আর বর্ণগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখে না; তার পড়ার ক্ষেত্রে পুরো শব্দই একক হিসেবে কাজ করে। সবক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরকে স্বচ্ছ করার নীতি গ্রহণ করা হলে, ভবিষ্যতে ছাপা হওয়া নতুন-পুরাতন বইয়ের যুক্তবর্ণ কিংবা সাইনবোর্ডসহ চারপাশের অন্য যুক্তবর্ণ পড়তে কোনো রকম সমস্যা হবে না। যুক্তাবর্ণকে স্বচ্ছ না করার ব্যাপারে যেসব যুক্তি, সেগুলোর পেছনে প্রথা বা ঐতিহ্য রক্ষা করার ইচ্ছাও আছে। শাহজাহান মিয়া বলেন, 'আমাদের লিপিগত ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত এসব প্রাচীন যুক্তবর্ণ আদলকে রক্ষা করা দরকার' (মিয়া, ১৯৯৪: ১৯৯)। তবে, তিনিও জানেন, যুক্তবর্ণসহ বাংলা বর্ণসমূহ প্রাচীন কাল থেকেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। ফলে, ঐতিহ্যের দোহাই এক্ষেত্রে খুব বেশি খাটে না।

যুক্তবর্ণ স্বচ্ছ করা হলে, শিক্ষার্থী অধিকতর দ্রুত পঠনযোগ্যতা লাভ করবে। পবিত্র সরকার যুক্তবর্ণকে স্বচ্ছ করার ব্যাপারে প্রস্তাব ও উদ্যোগ গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বলেন, ফলাচিহ্নগুলোরও অস্বচ্ছতা দূরে করে সেগুলোকে স্বচ্ছ করা দরকার। অর্থাৎ কোন ব্যঞ্জন কোন ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, এর পরিচয় যেন

যুক্তব্যঞ্জনে স্পষ্ট থাকে। তবে, ক্ষ এবং জ্ঞ-কে তিনি ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করেছেন; কারণ ক্ষ-এর ক+ষ উচ্চারণ এবং জ্ঞ-এর জ+ঞ উচ্চারণ বাংলায় নেই। আর রেফ ও র-ফলাকেও বিশ্লিষ্ট করার প্রয়োজন মনে করেন না তিনি। (সরকার, ২০০৪ : ৫১)

১১. সুপারিশমালা

যুক্তবর্ণের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন পণ্ডিতজন ও প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপের ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. কয়েকটি যুক্তবর্ণের আকৃতি বদলের প্রয়োজন নেই; এগুলো অস্বচ্ছ রূপেই বেশি পরিচিত। যেমন: ক্ষ, জ্ঞ, ট্র, ত্ত, থ। এগুলোর মধ্যে ক্ষ এবং জ্ঞ ভেঙে লিখলে উচ্চারণে দ্বিধা তৈরি হবে।

২. কিছু যুক্তবর্ণ অধিকাংশ জায়গায় অস্বচ্ছ রূপে দেখা যায়; এগুলোকে স্বচ্ছ রূপে নিয়ে আসা যায়। যেমন: ষ্ণ (ষ্ণ), হ্ম (হ্ম)। পশ্চিমবঙ্গে এ কাজটি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

৩. যেসব যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দুটি রূপই দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রে কেবল স্বচ্ছ রূপ ব্যবহার করা উচিত। যেমন: ক্ত ক^{ত}, গ্ধ, জ্ক, জ্ঞা, ঞ্চ, দ্ধ, ন্ধ, ব্ধ, স্থ, হ্ন। এক্ষেত্রে, যুক্তবর্ণকে সুচারু আকৃতি দিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন করে ফন্ট তৈরির প্রয়োজন হবে।

৪. কারচিহ্নগুলো সবক্ষেত্রে স্বচ্ছ রূপে ব্যবহৃত হবে। যেমন: গু, ব্রু, ব্রূ, শু, হু, হূ।

৫. যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলেও কারচিহ্ন স্বচ্ছ রাখতে হবে। যেমন: স্তু, স্তু।

৬. বাংলা ফলাচিহ্নগুলোর আকৃতি বদল করা উচিত হবে না। যেমন: স্ব, স্ম, স্য, স্র। তবে, ফলাচিহ্ন যুক্ত হলেও মূল বর্ণের আকৃতি অবিকৃত রাখা যেতে পারে; যেমন: ক্য, ক্র, ত্ব, ত্র, ভ্র, ষ্ম। ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে কারচিহ্ন যুক্ত হলে এমন হবে: ক্রু, ত্রু, দ্রু, দ্রূ, ভ্রু, ভ্রূ, শ্রু, শ্রূ, স্ক্র, স্ক্রু ইত্যাদি।

যাঁরা টাইপোগ্রাফি নিয়ে কাজ করেন, তাঁদেরকে কিছু যুক্তবর্ণের রূপকে অধিকতর স্বচ্ছ ও সুচারু করার জন্য কাজ করতে হবে। এ ধরনের যুক্তবর্ণের মধ্যে আছে: গ্ল, ঞ্জ, ড্ড, ঢ্ঢ, ণ্ঠ, ণ্ড, ন্ঠ, ন্ড, ন্ম, ন্ম, ন্স, ল্স, ব্ল, ম্ন, ষ্ফ, ষ্ম, হ্ম।

১২. উপসংহার

বাংলা যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ রূপের দ্বিধা ও সংকট কাটানোর জন্য যুক্তবর্ণকে অধিকতর স্বচ্ছ করার বিকল্প নেই। প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ও অধিকাংশ পণ্ডিতজনের প্রস্তাবও এটি সমর্থন করে। কাজটি শুরু করতে হবে পাঠ্যপুস্তক থেকে এবং এর ফলে

নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের হাতের লেখাতেও যুক্তবর্ণ স্বচ্ছ আকার ধারণ করবে। আর বাংলা ইউনিকোডসহ বিভিন্ন ফন্টেও যুক্তবর্ণকে স্বচ্ছ করতে হবে। ফলে, অনলাইন লেখায় এবং নতুন বইপত্রে যুক্তবর্ণের সমরূপতা তৈরি হবে।

টীকা

১. ঢাবিপু – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুথি

২. বাএপু – বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত পুথি

৩. বিচল হরফ প্রযুক্তিতে প্রতিটি হরফের জন্য আলাদা একটি ব্লক থাকে, যে ব্লকটিকে ইচ্ছামত নড়ানো ও বসানো যায়। জার্মানির ইয়োহানেস গুটেনবের্গ ছিলেন এই প্রযুক্তির উদ্ভাবক।

৪. টাইপের যে অংশটুকু ওপর থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে থাকে, তাকে 'করন' (kern) বলে। বাংলা টাইপকেসে প্রায় সব ব্যঞ্জনবর্ণের এবং তিন-চারটি স্বরবর্ণের পৃথক কারন্ড-দেহ আছে; এগুলোকে 'করন টাইপ' বলে। টাইপগুলোর আকার মূল টাইপের মতো, কেবল উপরে ও নিচে অল্প ফাঁক আছে – যেখানে চন্দ্রবিন্দু, রেফ, হ্রস্ব ই-কার, দীর্ঘ ঈ-কার, হ্রস্ব উ-কার, দীর্ঘ ঊ-কার, ব-ফলা, ম-ফলা, র-ফলা ইত্যাদি জুড়ে দেয়া যায়। বাংলা করন টাইপ সংখ্যা কম-বেশি ৪০টি। (সরকার, ২০০৭: ৫)

তথ্য-নির্দেশ

অজ্ঞাতনাম। (১৯৮৪)। বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার। *বাঙলা ভাষা* (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল। (১৯৮৬)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা*। ঢাকা: রশিদীয়া লাইব্রেরী

খান, ফেরদাউস। (১৯৮৪)। হরফ সমস্যা। *বাঙলা ভাষা* (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

চৌধুরী, জামিল। (১৯৯০)। *বানান ও উচ্চারণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

চৌধুরী, জামিল। (১৯৯৪)। *বাংলা বানান অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

চৌধুরী, মুনীর। (১৯৭০)। *বাঙলা গদ্যরীতি*। ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড

পান, প্রফুল্লকুমার। (২০০৬)। *বাংলা বর্ণপরিচয়ের দুশো পঁচিশ বছর*। কলকাতা: সাহিত্যলোক

ভট্টাচার্য, মিতালী। (২০১০)। *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*। কলকাতা: পারুল প্রকাশনী

মহাপাত্র, তুষারকান্তি। (২০০৫)। *ভাষাভাবনা: বাংলা ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক*। কলকাতা: অবভাস

মিয়া, মুহম্মদ শাহজাহান। (১৯৯৪)। *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

মুসা, মনসুর। (২০০৭)। *বানান: বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

রাব্বি, ফজলে। (২০০২)। *ছাপাখানার ইতিকথা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সরকার, অজরচন্দ্র। (২০০৭)। বাঙ্গালা টাইপ ও কেস। *বানান বিতর্ক*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

সরকার, পবিত্র। (২০০৪)। *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

হক, খন্দকার মুজাম্মিল। (২০০২)। *বাঙলা পুঁথির বানান সমস্যা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ঢাকা: সময়

হক, খন্দকার মুজাম্মিল। (২০১২)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সম্পাদনা*। ঢাকা: অবসর

Ross, Fiona. (1999). *The Printed Bengali Character and Its Evolution*. London : Curzon www.wikipedia.org/wiki/Bangla_alphabet